অধ্যায় ১ ঃ কবিতা — ১

অধ্যায়-বিন্যাস

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১.২ পরিচিতি

১.৩ নবদ্বীপ — বৃন্দাবন দাস

- ১.৩.১ কবি-পরিচয়
- ১.৩.২ সারসংক্ষেপ
- ১.৩.৩ কবিতার বিশ্লেষণ
- ১.৩.৪ শব্দার্থ

১.৪ রুপাই — জসিমউদ্‌দীন

- ১.৪.১ কবি-পরিচয়
- ১.৪.২ সারসংক্ষেপ
- ১.৪.৩ কবিতার বিশ্লেষণ
- ১.৪.৪ শব্দার্থ

১.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

১.৬ অতিরিক্ত পঠন

১.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

১.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.২ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- বৃন্দাবন দাস রচিত 'নবদ্বীপ' কবিতার কাহিনিভাগের সঙ্গে পরিচিত হবেন
- 'রুপাই' কবিতায় গ্রাম বাংলার অনুপম প্রকৃতিচিত্রের সঙ্গে আদর্শ পল্লীযুবকের ছবি আছে
- প্রতিটি কবিতার বিশ্লেষণ বা আলোচনাকে অবলম্বন করে অধ্যায়ের শেষে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে তার উত্তর লিখতে পারবেন এবং কবিতার নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যাও করতে পারবেন।

১.২ পরিচিতি

দেখুন, বাংলা কবিতা বললে ছন্দে লেখা, প্রায়ই অন্তমিল যুক্ত কয়েকটি লাইন বা

পংক্তির যে ছবি আপনাদের চোখে ভাসে বা যাকে আপনারা কখনও কোনো বইতে এবং পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন, তা কিন্তু বহুদিন আগেই লেখা শুরু হয়েছে। ধরুন সময়টা প্রায় দুহাজার বছর আগে। এখন থেকে যদি আমরা সেই সময়টাতে পিছিয়ে যেতে চাই তবে আপনাদের এক-দুই নয় একশো-দুশো বছর করে পিছিয়ে যেতে হবে। তবেই আপনারা এক সময় পৌঁছে যাবেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে। ১৪০১-১৫০০ (পঞ্চদশ শতক), ১৫০১/১৬০০ (ষোড়শ শতক)।

আপনাদের বর্তমান অধ্যায়ে যে দুটি কবিতা পড়তে হবে সেগুলো ভিন্ন সময়কালের মধ্যেই লেখা হয়েছিল। দুটি কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন দুটি প্রসঙ্গের মুখোমুখি হবেন আপনারা।

এখানে বলে রাখি, আপনাদের পুরনো বাংলার ভাষা নয়, কবিতার বিষয়বস্তুকেই জেনে নিতে হবে। তবে সেটা তো ভাষার মাধ্যমেই করতে হবে, তাই এই কথাগুলো বলা হলো। বর্তমান অধ্যায়ে আপনারা দুজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানবেন, কবিতার মূল বিষয় বা সার-সংক্ষেপ সম্বন্ধে জানবেন এবং কবিতার বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ পড়বেন। এঁদের মধ্যে জসিমউদ্‌দীন বাংলার পল্লীকবি হিসাবে খ্যাত।

১.৩ নবদ্বীপ — বৃন্দাবন দাস

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যদি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।।
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা।।
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায়।।
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।।
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।।
'ধর্ম-কর্ম' লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে।।
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়ে।
এই সবে রত আর কিছু না জানয়ে।

যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব।।
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্দী মরে।।
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন।।
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা' সভার মুখেও নাহিক হরিধ্বনি।।
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়ে।
'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়ে।।
গীতা-ভাগবতে যে যে জনে বা পঢ়ায়ে।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়ে।।
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার।।
কেমতে এসব জীব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার।।
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান।।
স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নানে কৃষ্ণের কথন।।
সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্বাদ।
শীঘ্রে কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

১.৩.১ কবি-পরিচয়

বাংলা ভাষায় লেখা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগুলোর মধ্যে সব থেকে প্রামাণ্য, তথ্যনির্ভর এবং পুরনো জীবনীগ্রন্থ হচ্ছে বৃন্দাবন দাসের রচিত 'চৈতন্যভাগবত'। এই গ্রন্থেরই আদি পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আপনাদের পাঠ্য কবিতাংশটি নেওয়া হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের জন্মকাল বা 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। আনুমানিক ১৫১৮ - ১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বৃন্দাবনে জন্ম হয়। আর আনুমানিক ১৫৪২ থেকে ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে গ্রন্থটি রচিত হয়। তবে এ-কথা ঠিক যে বৈষ্ণবদের মধ্যে এ-গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ছিল।

১.৩.২ সারসংক্ষেপ

এই কবিতায় চৈতন্যদেবের জন্ম হওয়ার আগে নবদ্বীপের অবস্থা কেমন ছিল, তা বলা হয়েছে। আপনারা জানেন, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত নবদ্বীপ অঞ্চল শিক্ষায় সংস্কৃতিতে প্রাচীন কাল থেকেই অগ্রগণ্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তা একটি বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। বৃন্দাবন এই নবদ্বীপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, চৈতন্য এখানে জন্ম নেবেন জেনেই বিধাতা যেন তাঁর আবির্ভাবের সমস্ত আয়োজন করে রেখেছেন। এখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসেন বিদ্যাচর্চার জন্য, কিন্তু এই চর্চা শুধুমাত্র ব্যবহারিক বিদ্যা বা কেজো বিদ্যার চর্চা। ধর্মকর্ম বলতে শুধু দেবী চণ্ডীর আরাধনা, কেউ কৃষ্ণনাম নেয় না। বিষ্ণু-মায়ায় সবাই মোহিত। লোকেদের মনে শুধু বিষয়-সুখের ভাবনা। এই অধঃপতিত সমাজকে উদ্ধারের জন্য 'কৃষ্ণচন্দ্র' শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও আশীর্বাদ চেয়েছেন কবি।

১.৩.৩ কবিতার আলোচনা

আপনারা দেখুন কীভাবে চৈতন্যদেবের জন্মের ঠিক আগে নবদ্বীপের সমাজ-চিত্র কবির কলমে ফুটে উঠেছে।

নবদ্বীপ হেন ..... থুইলেন তথা— কবি যখনকার বর্ণনা দিচ্ছেন তখন নবদ্বীপ একটি গ্রাম। ত্রিভুবনে কোথাও এমন জায়গা আর নেই। চৈতন্যদেব সেখানে অবতার রূপে জন্ম নেবেন জেনেই যেন বিধাতা সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছেন। চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে নবদ্বীপকে এবং সেখানকার মানুষকে অধঃপতনের হাত থেকে উদ্ধার করবেন, বিধাতা তাই সমস্ত নবদ্বীপে এমন অবস্থা করে রেখেছেন যে চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য সফল হয়। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে সবার মঙ্গল করবেন।

নবদ্বীপের সম্পত্তি ..... ব্যবহার রসে— কবি বলছেন,নবদ্বীপের মহিমা বা ঐশ্বর্যের বর্ণনা করা বেশ কঠিন কাজ। চৈতন্য-ভক্ত বৃন্দাবন এখানে যেন একটু ব্যঙ্গের সুরেই কথাগুলো বললেন। প্রশংসার আড়ালে নিন্দা এই কথাগুলো থেকে স্পষ্ট। তাঁর বর্ণনা পড়ুন— নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটে প্রায় এক লক্ষ লোক রোজ স্নান করেন। নানা জায়গা থেকে বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য লোকেরা নবদ্বীপে আসেন। লক্ষ্মীর আশীর্বাদে সবাই সেখানে সুখে বসবাস করেন। তবে সাংসারিক বা বৈষয়িক বিষয়ে মনোনিবেশ করেই তাঁরা সময় কাটান বা সময় নষ্ট করেন।

কৃষ্ণনাম - ভক্তিশূন্য ..... কিছু না জানয়ে— পুরাণে যে চারটি কালের কথা বলা আছে (সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ) তার চতুর্থটি হলো কলি। কবি বলছেন, কলিযুগের প্রথম ভাগ থেকেই নবদ্বীপের মানুষ বিষয়চিন্তায় মগ্ন হয়েছে। সংসারে কিছু আচার-আচরণ লোকে পালন করে, কৃষ্ণকে ভক্তি বা ভজনা কেউ করে না। ধর্ম-

কর্ম বলতে একমাত্র মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত। অনেক টাকা খরচ করে, কেউ কেউ বিষহরি বা মনসাদেবীর মূর্তি বানিয়ে পুজো করে। ছেলেমেয়েরে বিয়েতেও প্রচুর টাকা নষ্ট করে। এ-সব নিয়েই তারা আছে।

যেবা ভট্টাচার্য ..... নাহিক হরিধনি— ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র প্রভৃতি উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণেরাও গ্রন্থ পাঠ করে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারেননি। শাস্ত্র বচন পড়ে ও শুনিয়ে তাঁরা নিজেরাও শ্রোতাদের সঙ্গে অজ্ঞানতার মধ্যে বন্দী হয়ে আছেন। অর্থাৎ তাঁরা নিজেরা তো যথার্থ জ্ঞান লাভ করেনই না উপরন্তু শ্রোতাদেরও সেই অজ্ঞানতা দিয়ে বেঁধে রাখেন। এই পণ্ডিতেরা কৃষ্ণের কীর্তন করেন না, কৃষ্ণনামই যে যুগের ধর্ম তা-ও বলেন না। দোষ বা ত্রুটি ছাড়া কারও গুণের কথা তাঁরা উচ্চারণ করেন না। যে-সব পণ্ডিত এ-ধরনের অজ্ঞানীদের উপর বিরক্ত তাঁরাও কিন্তু মুখে হরিনাম নেন না। অর্থাৎ নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ নানা শাস্ত্র-বচনে পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। কবি এসব কথা বলে বোঝাতে চাইছেন যে শাস্ত্রে হরি বা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ থাকলেও পণ্ডিতেরা তাঁকে স্মরণ করছেন না। এটা কেন হচ্ছে, তার কারণ কবি পরে ব্যাখ্যা করেছেন।

অতি বড় সুকৃতি .... তাহার জিহ্বায়ে— পণ্ডিতেরা একমাত্র ভালো কাজ এটাই করেন যে স্নানের সময় '*গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ*' (কৃষ্ণের দুটি নাম) নামমাত্র উচ্চারণ করেন। গীতা বা ভাগবত যাঁরা জানেন বা পড়ান তাঁরাও কিন্তু এই গ্রন্থের কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন না। অর্থাৎ ঐ দুটি গ্রন্থের বক্তব্য তাঁরা শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলতে পারেন না।

এইমত বিষ্ণুমায়া ..... করেন ব্যাখ্যান— কবি এবার নবদ্বীপের এই অবস্থার মূল কারণ বলছেন। কবির মতে এটা বিষ্ণুমায়ার ফল। সমস্ত নবদ্বীপ ও তার অধিবাসীরা বিষ্ণু-মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছেন বলেই বিষ্ণুকে ভুলে বৈষয়িক চিন্তায় মগ্ন। তাই বিষ্ণুর ভক্তেরা দুঃখিত মনে জীবের উদ্ধারের কথা ভাবেন। কীভাবে যে সমাজকে বাঁচানো যায় ! বিষয়-সুখে মোহিত হয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে, বললেও কেউ কৃষ্ণনাম নেন না। বরং সবসময় নিজেদের অসার বিদ্যা ও বংশের গুণগান করতেই ভালবাসেন।

স্বকার্য করেন ..... সভারে প্রসাদ— একমাত্র ভাগবত বা কৃষ্ণভক্তরাই কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান ও কৃষ্ণের নাম প্রচার করেছেন— যেটা তাঁদের কাজ। তাঁরা সবাই মিলে সমস্ত জগতকে এই বলে আশীর্বাদ করছেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেন খুব শিগগিরই সবাইকে অনুগ্রহ করেন। অর্থাৎ নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়ে সবার কল্যাণ করেন।

১.৩.৪ শব্দার্থ

জাগরণ — চণ্ডীর গান। হেন — মতো।

কেমতে — কীভাবে। সভার — সবার।
নাঞি — নেই। প্রথম কলি — কলিযুগের।
পাশে — বন্ধনে। প্রসাদ — অনুগ্রহ প্রথম ভাগ।
সভে — সবাই। সুকৃতি — ভালো কাজ।
থুইলেন — রাখলেন। কুল — বংশ।
ভবিষ্য-আচার — নানা সাংসারিক রীতি-নীতি।
মোহিত — মুগ্ধ। বিষহরি— মনসাদেবী।
বিভায়ে — বিবাহে। মজিল — মগ্ন হলো বা ব্যস্ত হলো।
বসে — বসবাস করে। ব্যবহার রস — সাংসারিক বা বৈষয়িক কাজ।
কৃষ্ণচন্দ্র — কৃষ্ণ, কালাচাঁদ। বাখানে — ব্যাখ্যা করে। রমা — লক্ষ্মী।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

(ক) নবদ্বীপ কবিতাটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

.....

(খ) কবে বৃন্দবান দাস জন্মগ্রহণ করেন?

.....

(গ) কৃষ্ণচন্দ্র কে?

.....

(ঘ) নবদ্বীপে দেশ-দেশান্তর থেকে কেন লোকেরা আসতেন?

.....

(ঙ) কার দৃষ্টিপাতে সবাই নবদ্বীপে সুখে বসবাস করেন?

.....

(চ) দম্ভ করে কোন দেবীর পুজো নবদ্বীপের লোকেরা করেন?

.....

(ছ) কার মায়ায় সংসার মোহিত?

.....

(জ) ..... সব মজিল সংসার। — শূন্যস্থান পূর্ণ করুন।



আসুন, জেনে নিই —

জাগরণ — মঙ্গলচণ্ডীর গান চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাত জেগে গাওয়া হতো বলে এর আর এক নাম জাগরণ। আট (৮) রাত ধরে এই গান গাওয়া হতো।

১.৪ রুপাই — জসিমউদ্দীন

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল।
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দু'খান সরু;
গা-খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লি-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষী,
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।
সোনায় যে জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার,—
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে জন আলো বানায় ভুলায় সবার মন,
তারি পদরজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে-কালো তার মাঠেরি ধান, যে-কালো তার গাঁও
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানটানি!
'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দী' বেত যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়,— 'ছেলে নয়, ও 'পাগল' লোহা যেন!
রুপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছ হেন?

যদিও রূপা নয়কো রুপাই— রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।'

১.৪.১ কবি-পরিচয়

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলে কবি জসিমউদ্‌দীনে -র জন্ম হয় (১৯০৪ - ১৯৭৬)। পাশ্চাত্য আদর্শের অনুপ্রেরণায় রচিত বাংলা কাব্যধারার মধ্যেও যাঁরা পল্লীপ্রকৃতির সহজ সুন্দর জীবনকে নিজেদের কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে জসিমউদ্‌দীন অন্যতম। গ্রামবাংলার যাবতীয় বিষয়বস্তু বিশেষকরে প্রকৃতি, মানুষ একান্ত সহজভাবে ও ভাষায় তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হল 'রাখালী', 'নকসীকাঁথার সাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'বালুচর', 'মাটির কান্না' ইত্যাদি। আপনাদের পাঠ্য কবিতাটি কবির 'নকসীকাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.৪.২ সারসংক্ষেপ

কবি বর্তমান কবিতায় রুপাই নামে একটি ছেলের রূপ ও গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। পল্লীবাংলার আদর্শ ছেলে সে। কবিতায় তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশে প্রকৃতির নানা উপাদান দিয়ে গড়া রুপাইয়ের দেহের বর্ণনা, দ্বিতীয় অংশে কালো রূপের মহিমা ব্যাখ্যা এবং তৃতীয় অংশে রুপাইয়ের গুণের বিকাশ।

রুপাই গ্রামের এক চাষির ছেলে। মাথায় লম্বা চুল, মুখে শিশুর সারল্য, দেহের রঙ কালো। তার হাত, শরীর ও মুখের হাসি— সর্বত্র প্রকৃতির ছোঁয়া দেখা যায়। দেখতে কালো হলেও , কবি বলছেন কালোই জগতের আলো — রুপাইয়ের কালো বর্ণ দেখে বুক জুড়িয়ে যায় অর্থাৎ মন ভালো লাগে। রুপাইয়ের গায়ে শক্তিও কম নেই। লাঠির খেলায় সে সবার সেরা। খেলার দলে তাকে নেওয়ার জন্য সবার কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আবার গ্রামে যখন জারিগান হয় তখনও রুপাই সবার আগে। গ্রামের সবাই 'বাপের ব্যাটা' রুপাইকে ভালোবাসে, তার গুণগান করে। কবি বলছেন, এককালে এই রুপাইয়ের নামেই সমস্ত গ্রাম উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

১.৪.৩ কবিতার বিশ্লেষণ

এই গাঁয়ের ..... কতকটা তার হাসি — গ্রামের এক চাষির ছেলের কথা কবি বলছেন। তার মাথায় আছে লম্বা চুল। গায়ের রঙ কালো। পল্লীকবি জসিম্‌উদদীন প্রকৃতির নানা রঙ, নানা বস্তুর সঙ্গে প্রকৃতি-বালক রুপাইয়ের তুলনা দিয়েছেন।

ভ্রমর ফুলে-ফুলে বসে মধু সংগ্রহ করে, ফুলের রঙে সে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রুপাইয়ের কালো রঙের মুখ এতটাই সুন্দর যে ভ্রমর ফুল ভেবে অনায়াসে সেখানে বসতে পারে। শুধু কালোই নয়, সেই মুখ কাঁচা ধানের পাতার মতো সতেজ, সরল আর সেখানে আছে নতুন ওঠা ঘাসের কোমল স্পর্শ। দেখে মায়া হয়। অর্থাৎ সৌন্দর্য, সারল্য আর কোমলতায় ভরা রুপাইয়ের মুখ। চাল কুমড়োর সরু লতানো শাখার সঙ্গে কবি রুপাইয়ের দুই বাহুর তুলনা করেছেন। আর শরীরের বা দেহের তুলনা দিয়েছেন শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিভেজা কালো ***তমাল*** গাছের সঙ্গে। যেন শরীরটি তার মসৃণ বা তেলচকচকে। বৃষ্টি ধোয়া মেঘে যদি তেল মাখানো হয়, তাহলে যেমন দেখতে হবে— ঠিক তেমনটাই রুপাইয়ের দেহের রূপ। তার এই রূপে মুগ্ধ হয়ে বিজলি বা বিদ্যুৎ যেন লজ্জায় লুকিয়ে পড়ে। বিদ্যুৎকে কবি এখানে নারী হিসাবে কল্পনা করেছেন। সে তার আলোর খেলাও ভুলে যায় রুপাইয়ের রূপ দেখে— এটাই কবি ভাবছেন। কোনো চাষি হয়তো কচি ধানের চারা তুলতে গিয়ে হেসে ফেলেছেন, কেননা তার স্নিগ্ধ রূপ চাষিকে মুগ্ধ করেছে। রুপাইয়েরও তেমনি একটি স্নিগ্ধ শান্ত রূপ আছে।



তমাল ঃ এটা একটা ফলের গাছ। গ্রাম বাংলায় কালো রঙের তাল ফলকেও তমাল বলে। সাহিত্যে অনেক সময় তাল-তমাল শব্দটি এক সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

কালো চোখের তারা ..... উজল তাহার গাও — কবিতার এই অংশে কবি জগতের সমস্ত কালো রঙের জয়গান করেছেন। তিনি বলছেন — আমরা যে চোখ দিয়ে সমস্ত জগতকে দেখি তার মণির রঙ কালো, কালো রঙের কালি দিয়েই বই ছাপা হয়, আমাদের জন্মও অন্ধকার কালো মাতৃগর্ভে আর মৃত্যুর পর জীবনের আলো নিভে যায়— অনন্ত অন্ধকারে আমরা মিলে যাই — পৃথিবীময় এই কালো রঙ ছড়িয়ে আছে। জীবন ও মৃত্যু— সর্বত্র কালোরই জয়জয়কার। কিন্তু চাষির ছেলে রূপাই যেন এইসব কালোকে জয় করেছে। পৃথিবীর সমস্ত কালোর চেয়ে সে মহান।

কবি বলছেন, সোনা দিয়ে যে সোনার গয়না বানায় তার আবার গর্ব কোথায়? সোনা তো নিজেই উজ্জ্বল, মহার্ঘ। রঙ যদি হাতের কাছে ঠিকঠাক পাওয়া যায় তবে কবির মতো যে কেউ রামধনুকের সাতরঙাহার বানিয়ে ফেলতে পারবেন। অর্থাৎ যা স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দর তাকে ব্যবহার করে আরো সুন্দর কিছু তৈরি করা অনেক সহজ। কিন্তু যা স্বাভাবিকভাবে অসুন্দর, কুৎসিত তা-ই যখন সুন্দর হয়ে উঠে সবার মন জয় করে, তখন তার মহিমা অনেক বেশি হয়ে দেখা দেয়। উদাহরণ হিসাবে কবি বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের কালো রঙের কথা ইঙ্গিতে বলেছেন। তিনি রূপে কালো হলেও গুণে অসীম — তাই তাঁর পায়ের ধুলো আশীর্বাদ হিসাবে পাওয়ার জন্য ভক্তের আকুতি তীব্র।

রুপাইয়ের শরীরে সোনা বা পিতল কোনোটাই নেই যা তাকে ঔজ্জ্বল্য দেবে। তার কালো রঙই এমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল যে তা কবির মনকে শান্তি দেয়, তাঁর বুক জুড়িয়ে যায়। মাঠের ধানে আর গ্রামের শরীরে যে কালোরঙ ছড়িয়ে আছে অর্থাৎ গ্রামের প্রকৃতিতে যত কালো রঙ ছড়িয়ে আছে তাতে স্নান করে বা সিক্ত হয়ে

রুপাইয়ের শরীর যেন উজ্জ্বল হয়েছে।

আখ্‌ড়াতে **তার ..... গাঁ হবে নামী**— এই পংক্তিগুলোতে কবি এবার রুপাইয়ের গুণের বর্ণনা ও প্রশংসা করছেন। লাঠিখেলায় রুপাই ওস্তাদ। ***আখ্‌ড়া***তে এ-জন্য তার অনেক সম্মান। সবাই তাকে দলে নিয়ে খেলতে চায়। শুধু তাই নয়, গানেও সে সবার চেয়ে দক্ষ। জারিগান যখন গাওয়া হয় তখন তার গলাই সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। গ্রামবাংলার জলাভূমিতে একটু মোটা ও লম্বা আকৃতির বেতগাছ পাওয়া যায়, যাকে 'শালসুন্দরী' বেত বলা হয়। কবি বলছেন রুপাই যেন সেরকমই। সমস্ত কাজেই ওই বেতের প্রয়োজন হয় — রুপাইও তেমনি সব কাজেই সমান ওস্তাদ। তাকে দেখে গ্রামের বুড়োরা বলেন, রুপাই ছেলে নয়, ও একটা পাগল লোহা— রুপাইয়ের মতো 'বাপের ছেলে' কেউ দেখেছে কখনো— এটা তাঁদের প্রশ্ন। রুপাই রূপা নয়, কিন্তু তার চেয়েও সে মূল্যবান। কবি বলছেন, একদিন ওর নামেই সমস্ত গ্রাম উজ্জ্বল হয়ে উঠবে— ওর নামেই সবাই গ্রামটিকে চিনবে।

আখ্‌ড়া ঃ গ্রাম বাংলায়, এমনকী শহরাঞ্চলেও শরীর চর্চার জন্য কিছু নির্দিষ্ট জায়গা ছিল। একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কিশোর ও তরুণ বয়সের ছেলেরা সেখানে ব্যায়ামচর্চা করতেন। সেই সঙ্গে লাঠিখেলা, কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, তরোয়াল খেলা ইত্যাদি নানা ধরনের শরীরের চর্চা করত ছেলেরা। এগুলোকেই আখ্‌ড়া বলে। অনেকটা এখনকার 'জিমনাসিয়াম' বা শরীর চর্চার (বডি বিল্ডিং) ক্লাবগুলোর মতো। তবে বৈষ্ণবদের সাধন-ভজনের আশ্রমকেও আখ্‌ড়া বলা হয়।

১.৪.৪ শব্দার্থ

তৃণ — ঘাস।
ধরা — পৃথিবী।
গাঁও — গ্রাম।
দেছে — দিয়েছে।
জারিগান — এক ধরণের পল্লী-সংগীত
বিজলি — বিদ্যুৎ।
গাও— শরীর।
শাওন — শ্রাবণ মাস।
কেতাব — বই।
সিনান — স্নান।
পদরজ — পায়ের ধুলো।
উজল— উজ্জ্বল, চকচকে।
দ'তের — দোয়াতের।
মানী— মান্য, মাননীয়।
তরু — গাছ।
নবীন — নতুন।
জালি লাউ — কচি চালকুমড়ো।
শোকগীত — কারবালার দুঃখজনক ঘটনা বা গ্রামের কোনো দুঃখজনক ঘটনাকে নিয়ে তৈরি গান।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ২ ঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন —

(ক) জসিমউদ্‌দীন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

.....

(খ) জসিমউদ্‌দীনের সমস্ত কবিতার মূল বিষয়বস্তু কী?

.....

(গ) 'কালো মুখেই কালো প্রজাপতি/ভ্রমর' — কোনটি শুদ্ধ?

.....

(ঘ) কবি রুপাইয়ের গা-খানিকে কোন তরুর সঙ্গে তুলনা করেছেন?

.....

(ঙ) আলোর খেলা ভুলে কে লজ্জায় লুকিয়ে পড়ে?

.....

(চ) কালো কালি দিয়ে কী কী লেখা হয়?

.....

(ছ) রুপাই কোন ধরনের বেত?

.....

(জ) রুপাই 'পাগল' লোহা না 'তরল' লোহা?

.....



১.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- যে দুটি কবিতা পড়া হল সেগুলোর প্রথমটি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত হয়েছে। সময়কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক।
- 'বংশীনাদে' কবিতায় বিরহিনী রাধার কাতরতার ছবি ফুটে উঠেছে।
- শ্রীচৈতন্যের জন্মের আগে নবদ্বীপ অঞ্চলের সমাজ তথা লোক-জন , আচার-ব্যবহার কেমন ছিল তা জানা যায় 'নবদ্বীপ' কবিতায়।
- আধুনিক যুগে ব্যক্তি মানুষের কথা কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে।
- জসিমউদ্দীনের কবিতায় আছে প্রকৃতি ও মানুষের নিকট সম্পর্কের ছবি।



১.৬ অতিরিক্ত পঠন

১) গুপ্ত, ক্ষেত্র; *মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প ।*

২) বসু, শঙ্করীপ্রসাদ; *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য।*

৩) *জসিমউদ্দীনের কবিতা সংকলন।*

৪) ত্রিপাঠী, দীপ্তি; *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়।*

৫) মিত্র, প্রেমেন্দ্র; *কবিতা সংগ্রহ।*

৬) সিকদার, অশ্রুকুমার; *হাজার বছরের বাংলা কবিতা।*

৭) সিকদার, অশ্রুকুমার; *আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়।*

৮) বিশী, প্রমথনাথ; *বাংলার লেখক ও কবি।*

৯) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার; *উনিবিংশ শতাব্দীর শতকের গীতি কাব্য।*

১০) রায়, কালিদাস, *পদাবলী সাহিত্য।*

১১) সিকদার, অশ্রুকুমার, *হাজার বছরের বাংলা কবিতা।*

১২) সেন, সুকুমার (সম্পা); *চৈতন্যভাগবত।*

১৩) সেন, সুকুমাব; *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, ২য় এবং ৫ম খণ্ড)।*



১.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ (ক) *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের আদিপর্বের অন্তর্গত দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে।

(খ) আনুমানিক ১৫১৮ - ১৯ খ্রিস্টাব্দে।

(গ) শ্রীকৃষ্ণ।

(ঘ) বিদ্যালাভ করার জন্য, বিশেষ করে শাস্ত্রবিদ্যা।

(ঙ) রমা অর্থাৎ লক্ষ্মী।

(চ) বিষহরি বা মনসাদেবী।

(ছ) বিষ্ণু-মায়ায়।

(জ) বিষয়-সুখেতে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ (ক) বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলে।

(খ) প্রকৃতি।

(গ) ভ্রমর।

(ঘ) তমাল।

(ঙ) বিজলি মেয়ে।

(চ) কেতাব, কোরান।

(ছ) শাল-সুন্দী।

(জ) পাগল লোহা।



১.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ নবদ্বীপের পণ্ডিতদের যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তা অনধিক ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

প্রশ্ন ২ ঃ 'রুপাই' কবিতা অবলম্বনে রুপাইয়ের দেহের বর্ণনা দিন। (শব্দসংখ্যা অনধিক ৪০০)

প্রশ্ন ৩ ঃ রুপাইকে কেন গ্রামের সবাই ভালোবাসে, কারণগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

প্রশ্ন ৪ ঃ ব্যাখ্যা লিখুন (১৫০ শব্দের মধ্যে)—

(ক) ধর্ম-কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে।।

(খ) বাদল-ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লি-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল।

(গ) যদিও রূপা নয়কো রুপাই— রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে তরই নামে সব গাঁ হবে নামী।